

# ধর্ম হোক মানবতার জন্য

নিশাত রহমান ॥ আমাদের সমাজে নানা কারণে হালে ধর্মীয় উগ্রবাদ একটা বহুল আলোচিত বিষয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় বিকাশেও ধর্মাত্মতার আলোচনা খুবই সঙ্গতিপূর্ণ একটা বাস্তবতা। সেই সাথে গোটা পৃথিবীতে, আমাদের প্রিয় এই গ্রহে নানা স্থানে নানাভাবে ধর্মীয় উগ্রবাদের পুনরুত্থানও একটা নতুন বাস্তবতা বটে। সব মিলিয়েই ধর্মাত্মতা সম্পর্কে একটা বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা পদ্ধতির ঐক্য আজ খুবই অপরিহার্য।

আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্মভিত্তিক চিন্তার অনুসারীরা মৌলবাদকে মূলের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা মতবাদ হিসেবে বিবেচনা করে এবং আজকাল কেউ কেউ নিজেদের মৌলবাদী হিসেবে চিত্রিত করে গর্ববোধও করে। কিন্তু মৌলবাদের মূলসূত্র মোটেই তা নয়। কি সঠিক কি বেঠিক যে কোনো দার্শনিক চিন্তারই একটা মৌলিকত্ব কিংবা স্বাতন্ত্র্যতা আছে। সেই অর্থে সেই চিন্তারও একটা মূল বা ভিত্তিভূমি থাকতেই হবে। তা দিয়ে মোটেই চিন্তার সঠিকতা, বেঠিকতা প্রমাণিত হয় না। যদিও এ কথা ঠিক যে আজকের ধর্মচিন্তা মূল অর্থেও পৃথিবীর আদি ধর্ম চিন্তা নয়। তাছাড়া শব্দটার ইংরেজি ভাষান্তর (Rootism) রুটইজম নয়, Elementism-ও নয়, ওটা Fundamentalism। এই বক্তব্যটা যা কিনা Fundamentalism বা ভৌতিকতা বা ধর্মীয় উগ্রবাদ বা মৌলবাদ এলো কোথা থেকে। Fundamentalism-কে কি বলবো মৌলবাদ না অন্য আরো গ্রহণযোগ্য কোনো বাংলা প্রতিশব্দ বলবো সে বিবেচনার দাবি রাখতে পারে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যদি সম্পাদ্যটিকে সর্বোতভাবে তুষ্টি করে তবেই আমরা একমত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত একত্রে যেতে পারবো।

মানুষের সাথে প্রকৃতির যে বিকাশমান সংঘাত তার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সে অগ্রসরতা আদি থেকে অন্ত অবধি বিস্তৃত কিনা, সে বিবাদ শাস্ত্বত কিনা সে সব দিকে গেলে ধান বানতে শিবের গীত হয়ে যাবে। তাই সে দিকে না গিয়েও মোটামুটিভাবে এটা বলা যায় যে মানুষ নানা সময়ে নানা স্থানে নানাভাবে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে প্রকৃতিকে এবং নিজেকে প্রতি নিয়ত পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তনের নানা আঁকাবাকা পথেই মানুষকে অগ্রসর হতে হয়েছে।

এই পরিবর্তন কখনো সেরাতুল মুস্তাকিমের মতো সরল পথের আবার কখনো বাঁকা পথেরও বটে। অর্থাৎ কখনো পরিমাণগত পরিবর্তন মানুষকে অগ্রসর করেছে আবার কখনো গুণগত পরিবর্তন তাকে বিকশিত করেছে।

এই ধারাবাহিকতায়ই মানুষ একদা অলিম্পাস (আলপস) পর্বতমালার দেব-দেবীদের ক্রিডানক হিসেবে নিজেকে ভেবেছে। গ্রীক এবং রোমান প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যগ্রন্থ তার সাক্ষ্যই হয়ে আমাদের মাঝে আজও বিরাজ করে। সে সময়ের জীবনের প্রতিবিম্ব যে সব সাহিত্য তার মধ্যে হোমারের ইলিয়ট এবং ওডিসি, সফোক্লিসের ইডিপাস, আগামেনন এগুলো খুবই উল্লেখযোগ্য। এদের চিন্তায় অলিম্পাস পর্বতের দেব-দেবী এবং তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে যে বক্তব্য আছে তার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মৌলিকতা আছে। সেটা শুধু চিন্তায় নয়, অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেও যে কোনো কাল্পনিকতায় একটা বাস্তবিকতা সুপ্ত থাকবেই। তা হয়তো একটা সময়কেও তুষ্টি করে। কিন্তু তাকে ভিত্তি করে আদি থেকে অন্ত অবধি একরকম ভাবাটাই হলো উগ্রবাদ। সময়ের সাথে জীবনের পরিবর্তনের যে বাস্তবতা তাকে ভিত্তি করে চিন্তা পরিবর্তিত না করাই হলো ধর্মাত্মতা। যদিও শব্দগতভাবে ফাডামেন্টালিজম তখন ছিল বলে জানি না তবে এটা জানা যায় যে গ্রীক এবং রোমানরা সেই অলিম্পাস পর্বতের দেব-দেবীর কাছে আর থাকেনি। তারা চলে এসেছিল পরিবর্তন বা বিবর্তনের ধারায় বেথেলহেমের ঈসা-মসির কাছে। এভাবেই সারা পৃথিবী বহু ঈশ্বরবাদিতার যুগ থেকে এক ঈশ্বরবাদিতার যুগে এসেছে। তাই সর্বোতভাবে বিকাশ লাভ ঘটেছে যীশুর, গৌতম বুদ্ধের এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর। প্রশ্ন হলো যে চিন্তায় তাঁরা ছিলেন সেই বহু ঈশ্বরবাদিতা নানাভাবেই প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় আনার ক্ষেত্রে অনেক নিয়ামক ভূমিকা মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সেই মূলকেই আবার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়িত করে এই মানুষই পরিমাণগত পরিবর্তনকে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকাশ ঘটিয়েছে।

এই বিকাশের ধারাবাহিকতায় মানুষ এক ঈশ্বরবাদিতায় পৌঁছেছে। আলোচনার এই মাঝপথে এসে সকলের নিকট আমি একদফা ক্ষমা চাইছি এ জন্য যে আলোচনাটার সিংহভাগই ইউরোপীয় বিকাশ ধারা অবলম্বনে করা। এক্ষেত্রে আমার সীমাবদ্ধতার দায় আমারই। সে কথা স্বীকার করেও বলতে চাইছি যে ওরা ওদের ইতিহাসকে যেভাবে বিকশিত করে তুলে ধরতে পেরেছে আমরা ততোটা পারিনি। ফলে বাস্তবতা হলো এই যে আমরা আমাদের সম্পর্কে খুবই কম জানি। তাছাড়া আমাদের বিকাশ ধারাটাও ওদের তুলনায় যথেষ্ট জটিল। তাই প্রথম ওদের লঠন হাতে নিয়ে তার আলোতে আমাদের সত্যকে আমরা খুঁজে বের করার বিকল্প পথগুলো পর্যালোচনা করিনি। এ জন্য আশা করি আমি মার্জনা পাবো।

যাক আমার যে থিম তাতে বলা হয়েছিল প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় আনার মানবিক প্রচেষ্টা হিসেবে নানা ধর্মচিন্তার কথা। সাদা কথায় পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় মানুষ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। আর একটু গুছিয়ে বললে সমাজ সভ্যতাকে অগ্রসর করার জন্য মানুষ যে দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে তাই ধর্ম। মানুষের বাস্তবিক গুণাবলীর সুসংঘবদ্ধ স্বরূপই ধর্ম। এই ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশ পৃথিবীর যেখানেই যেভাবেই ঘটেছে তা হলো নিদারুণ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে বেথেলহেম কিংবা মক্কা কিংবা সাহারা মরুভূমির প্রচণ্ড দাবদাহে পুড়ে পুড়ে তাঁরা জীবনের সত্যের সন্ধান করেছিলেন। আদিতে ভূমধ্যসাগরে উত্তাল তরঙ্গমালায় জীবন মোহনার সন্ধান করতে করতে করতাই আলপস পর্বতের উপকণ্ঠের বহু ঈশ্বরবাদিতার ধর্মের গোড়াপত্তন ঘটেছিল।

কৃষ্ণসাগর কিংবা বাল্টিক সাগরের লু হাওয়ায় জীবন বরফ ঢাকা পড়তে পড়তে তারা জীবনের সন্ধান করতে শিখেছিল। আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড লাভা উদগীরণের মধ্যে জীবন ছাই হয়ে যাওয়া, ভূমিকম্পে মানব জীবন তছনছ হয়ে যাওয়া থেকে তারা কনফুসিয়াস ধর্মের সন্ধান পেয়েছিল।

কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণরূপে আলাদা। আমাদের প্রতিকূলতা অন্যদের তুলনায় খুবই স্বল্প কিন্তু জটিল। তাই আমাদের বিকাশ ধারাটাও জটিল। এই জটিলতা সঠিকভাবে না ধরতে পারলে আমাদের যে কোনো সর্বোচ্চ প্রগতিশীলদেরও উগ্রবাদী হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকেই যায়।

যে কোন নৃ-তাত্ত্বিক স্বীকার করবেন বেবিলিয়নের সভ্যতা, রোমান সভ্যতা কিংবা গ্রীক সভ্যতার চেয়ে হরোপ্লা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতা এবং বাঙালি সভ্যতা অনেক জটিল এবং কঠিন বোধের বিষয়।

যে কোনো ভূগোলবিদ স্বীকার করবেন ভারত মহাসাগরের সমুদ্রস্রোত অন্য পৃথিবীর যে কোন মহাসাগরের সমুদ্রস্রোত থেকে জটিল ও কঠিন। হিমালয়ের পাদদেশের এই জনপদের ধর্ম, চিন্তা, চর্চা তাই অন্য পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাইরের প্রতিকূলতার চেয়েও অনেক বেশি অন্তর্গত প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে করেছে এই অঞ্চলের দিকপাল মানুষেরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাই সারা পৃথিবী যখন শুরু করেছে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় আনার প্রচেষ্টা, তখন আমরা শুরু করেছি - মানবিক প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় আনা। অর্থাৎ আমাদের শুরুটা আর্যদের বিপক্ষে অনার্য সংহতির কথা থেকে। সে কারণেই আমরা আর্য থেকে বর্গী পর্যন্ত শুধুই মানবিক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে অগ্রসর হয়েছি। সে পটভূমিতেই আমাদের ধর্ম চিন্তায় চার্বীক মুনি থেকে গৌতমবুদ্ধ পর্যন্ত বিকাশ লাভ ঘটেছে ব্যক্তিক নির্মোহ সাধনার স্থান থেকে এবং তারই গর্ভে জন্ম নেয় বেদান্ত দর্শন, আমাদের হিন্দু মিথলজির প্রখ্যাতি

সাধক বাবা লোকনাথ থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত শুধুই ব্যক্তিক প্রতিকূলতার সাধনা। ফলে যে দাবদাহের পটভূমিতে আজও জেরুজালেম জ্বলছে আমাদের কৃষ্টিতে তা নেই। আমরা এ ভূখণ্ডে বহু ঈশ্বরবাদিতার রূপে আচ্ছাদিত হিন্দু ধর্ম এবং জীবপ্রেমের বৌদ্ধ ধর্ম মিলেমিশে ছিলাম। বিরোধ ছিল হিন্দু-বৌদ্ধতে কিন্তু এ বিরোধ বিগ্রহে রূপ নেয়নি কখনো।

এমন কি মোঘল পাঠান শাসনামল পর্যন্ত রাজতন্ত্রের বিরোধ বড় ধরনের কোনো ধর্ম বিরোধের জন্মই দেয়নি। আমাদের অঞ্চলে ধর্মবিরোধের মূল সূত্রপাত ইংরেজ শাসন থেকেই।

ফলটা যা হবার তা হলো আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বিকাশ ঘটতে পারলাম না। আমাদের ধর্মবোধ কখনই বিরোধের আগু পুরীক্ষায় পরীক্ষিত হয়নি। ইউরোপ রাজা চতুর্দশ লুই মোকাবেলা করেছিল তার ভিত্তিতে ফরাসী দেশ অগ্নিগর্ভ হয়েছিল, ইংল্যান্ড কিং হেনরি, কিং জন, কিং লিয়ারদের মোকাবেলা করতে করতে অগ্নিগর্ভ হয়েছিল তারই ভিত্তিতে সমাজে ভলটেরার-রুশো জন্মেছিল। উগ্র ধর্মান্ধদের গিলোটিনে হত্যা করে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সূত্রপাত করেছিল আমরা তখন শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে ছিলাম। ফলে ওদের ভাষায় ভারতবর্ষের এই ঘুমন্ত গ্রামকে লুটপাট করা সহজ হয়েছিল।

সত্যিকারভাবে এখনো হিমালয়ের পাদদেশে ঘুমন্ত গ্রাম। তাই আজও আমরা আমাদের আত্মস্থ আশ্রয় খুঁজে বের করিনি। আজো আমরা চার্বাক মুনিকে জানি না। আজো আমরা চৈতন্য দেব আর গৌতম বুদ্ধের বিকাশ ঘটতে পারিনি। আজো আমরা টিকিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর নিমাইর পার্থক্য বুঝতে পারি না। আজো আমরা রামকৃষ্ণের গণতন্ত্র ধারণার সাথে নিজেদের পরিচিত না করে আব্রাহাম লিংকন খুঁজে বেড়াই। পৃথিবীরাজের সাথে খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতীর বিরোধের সত্যাসত্য যদি আমরা ধরতে পারতাম তা হলে আজ ওহাবী বা খেলাফত আন্দোলনের নামে আচরণ সর্বস্ব শরিয়া চিন্তায় আমাদের বন্দি হতে হতো না। এক ঈশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সর্বোচ্চ বিকশিত ইহজাগতিক চিন্তার জনক লালনকেই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাধক পুরুষ, শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারতাম।

যাক, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় যে যুগ বৈচিত্রের সন্ধান আমরা পাই তাতে এটা খুবই পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় যে, কাউকে হত্যা না করেও নীরব বিপ্লবে আমরা বেদান্ত দর্শন থেকে লালনের বাউল দর্শনে উপনীত হয়েছি। গৌতম বুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যে মানবিকতার জন্ম হয়েছে তার ধ্রুগকে আমরা বিকশিত করতে পারিনি। বিকশিত করার উদ্যোগ নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে মার্টিন লুথার কিং থেকে শুরু করে চ্যারিটি অব মিশনের মাদার তেরেসা প্রমুখরা।

অথচ মানবতার মূল মর্মদর্শন আমাদের হিমালয় অববাহিকারই দর্শন। এ দর্শন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শন, এ দর্শন গৌতম বুদ্ধের দর্শন, এ দর্শন লালনের দর্শন, এ দর্শন খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতীর দর্শন।

এসব নিয়ে সাধক নজরুলের খেদউজির সীমা ছিল না। এসব কারণেই সাধক কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, ‘বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে - বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজি হাদিস কোরআন চষে।’ তিনি আরো বলেছেন, ‘আনোয়ার আনোয়ার যে বলেছে মুসলিম জিব ধরে টান তার, দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার।’ - কিন্তু কেন? কেন আমাদের এই পশ্চাদ পদ অবস্থা? কেন আমরা আমাদের শিকড়ের সন্ধান করতে ব্যর্থ হচ্ছি?

আমরা মনে করি অতীত আঁকড়ে ধরা হলো ধর্মান্ধতা আবার অতীত বর্জন করাও ধর্মান্ধতার পরিণতি লাভ করে। যদি অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রেরণা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই তবেই আমরা প্রগতিশীল। এদেশে এক শ্রেণীর ধর্মীয় উগ্রবাদী চিন্তার ধারকগণ আমাদের বহু পেছনে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে। তারা নিঃসন্দেহে ধর্মান্ধ। আবার প্রগতিশীলতার নামে যারা অতীতের সাথে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করে ধারাবাহিকতার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে আমাদের ছিন্নমূল বানিয়ে সামনে নিতে চেয়েছে বা চাচ্ছে তারাও এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ। কেননা সকলেই জানেন পানির উপর ছিন্নমূল কচুরিপানা সোজা পথে সামনে অগ্রসর হয় না। বাতাসের বেগ অনুযায়ী ডানে কিংবা বামে সুবিধা মতো অবস্থানে চলে যায়। আমাদের দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের কর্মীদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। রাজনীতিকরা প্রচণ্ড চেষ্টা কষ্ট করে অনেক প্রগতিশীল কথা শিখিয়ে কর্মী তৈরি করেছেন। সে কর্মীটি চলে গিয়েছে শৈর জেনারেলদের পকেটে। ফলে তাদের বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ বছরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

একদিকে আমাদের দেশের উগ্র ধর্মান্ধরা আমাদের চৌদ্দশত বছর পিছনে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কৃষ্টির আদলে তৈরি করতে চেয়ে প্রকৃত ইসলামকে রাজনৈতিক ইসলাম বানিয়ে আমাদের সামনে হাজির করেছে। আবার অন্যদিকে সমাজ প্রগতির নামে ইউরোপীয় ধাঁচে আমাদের কৃষ্টি বিবেচনায় না এনে আমাদের ছিন্নমূল করে অগ্রসর করার চেষ্টায় রত অতি অগ্রসরবাদীরা আমাদের মনন তৈরি করতে চেয়ে উগ্রবাদী হিসেবে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। তারা এমনকি চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান ইত্যাদিও বলেছে। তোমার বাড়ি আমার বাড়ি নকশাল বাড়ি নকশাল বাড়ি ইত্যাদিও বলেছে। আবার আমরা হবো তালেবান বাংলা বলে আফগানিস্তানও বলেছে ফলে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একদিকে যুবসমাজ বিভ্রান্ত হয়ে যার মতের সাথে নিজের মত মিলে না তাকেই কাফের ফতোয়া দিয়ে হত্যা করে ঘাতক দালালে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে একদল চীনের চেয়ারম্যান এবং নকশাল বাড়ি পরিত্যাগ করে কোনো সামরিক জেনারেলদের ছত্রছায়ায় নেতৃত্ব বরণ করেছে। যদি এ যুব সমাজ সব রকম ফতোয়াবাজি বাদ দিয়ে লালন থেকে হাসন-জালালের পথ ধরে বর্তমানের সত্যানুসন্ধানীদের সন্ধান করতো তা হলে আমাদের দেশে এতদিনে সত্যধর্ম বা মানবতার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। আমাদের শিখতে হবে গোবিন্দ দাস থেকে আরজ আলী মাতুব্বর পর্যন্ত যারা ছিলেন তাদের থেকে এবং সে শিক্ষাকে আরো বিকশিত করে আমাদের নিজেদের বুলি ভরতে হবে এবং বুলিও তৈরি করতে হবে। আমাদের কৃষ্টি, আবেগ, উচ্ছ্বাস ও বিশ্বাস ইউরোপ, চীন কিংবা আরব ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এ কথা মনে রেখেই আমাদের মানসিক কাঠামো তৈরি করতে হবে। তবেই আমরা সত্যিকারের সত্য ধর্মের সন্ধান পাবো এবং ধর্মান্ধতা ও উগ্রবাদ বিরোধী মুক্ত চিন্তার চর্চাকেন্দ্র হিসেবে এ ভূখণ্ডকে গড়ে তুলতে পারবো। এখানকার তিন হাজার বছরের লোকাচারকে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টাই হলো উগ্রবাদ।

এসব দিয়ে আমি কিন্তু শুধু লালন-জালালের মধ্যে আটকা থাকার কথা বলছি না। তাদেরকে ধারণ করে এবং ভিত্তি রচনা করেই অগ্রসর হতে হবে। সেটাই সত্যিকারের প্রগতি।

ধর্ম প্রসঙ্গে আমি পূর্বাফেই বলেছি যে, আমরা যা ধারণ করি তাই ধর্ম। ধারণ করার অর্থ হলো চেতনায় ধারণ করা। যা ভাব এবং বাস্তবিক ক্রিয়াতেই কেবল সম্ভব। ভাব এবং ক্রিয়ার এক চমৎকার শরবত (দ্রবন)-ই হলো ধারণা। সেখান থেকেই ধর্ম সৃষ্টি। তাই অন্য কথায় ধর্মকে কর্মও বলা যায়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, ‘সম্যক কর্ম সম্যক সময়ে সুসম্পন্ন করার নামই হলো ইবাদত।’ কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আমরা কর্মকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করে মগ্ন চৈতন্যে কর্মের সাধনা করি না বা একাগ্রতার সাথে আমাদের কার্য সম্পাদন করি না।

তাই আমাদের কর্ম আমাদের ধর্ম হয়ে আমাদের বিশ্বাসবোধকে পাকাপোক্ত করে না। আমরা সৃজনশীল বা সৃষ্টিশীল হতে পারি না। অন্য কথায় আমরা সৃষ্টিকর্তা বা স্রষ্টার রঙে রঞ্জিত হতে পারছি না। ধর্মকে অন্য কথায় বললে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির বিলীন হওয়ার সম্পর্কও বলা যায়। স্রষ্টা বেঁচে থাকবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, আমি বেঁচে থাকবো আমার সৃজনশীল কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার রঙে রঞ্জিত হয়ে - এটাই তো সত্য; অথচ এই সত্যই আজ আমরা উপলব্ধি করতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছি।

এখন প্রশ্ন হলো আমার কর্মক্ষেত্র কোথায় এবং কেমন? আবার যদি আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই তবে দেখবো যে, মানুষের সাথে প্রকৃতির যে প্রতিকূল সম্পর্ক তাকে অনুকূলতায় আনা হলো মানুষের আশুকর্ম। আবার এই কর্ম মানুষ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হলে সে বাধা অপসারণ করাই হলো মানুষের কর্ম। সুতরাং মানুষের কর্ম বা ধর্ম মূলত দুটি মিলে এক হলো, যা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় আনা।

এবার যদি আমরা আমাদের মাটির ধর্ম সংস্কারকদের দিকে তাকাই তবে এসব চিত্র পরিস্কারভাবে দেখতে পাবো। প্রথমতঃ পৃথিবীরাজের প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় এনেছিলেন খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতি (রাঃ), খান জাহান আলী বাগেরহাটে নোনা পানির সমস্যা মোকাবেলায় মানুষের জন্য সুপেয় পানির দীঘি খনন করেছিলেন এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় অনুকূলতা আনয়ন করেছিলেন। হযরত শাহজালাল রাজা গৌর গোবিন্দের প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় পরিণত করেছিলেন। অথচ আজ ধর্মাবলম্বীদের চক্রান্তে ও উগ্রবাদিতায় ধর্ম কতকগুলো আচরণ সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়ে রাজনৈতিক রূপ ধারণ করেছে। এর একটা কারণ আমরা খুঁজে পাই যা হলো - কেন আমরা ধর্মকে হিমালয় অববাহিকার মানুষেরা কর্ম হিসেবে বিকশিত করতে পারলাম না?

ইতিহাস বলে ব্যক্তির ভূমিকা নির্দিষ্ট বিভিন্ন উৎপাদন প্রণালীকে ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। রাজা এবং প্রজা ভিত্তিক যে সমাজ সে সমাজের কৃষ্টি, রীতিনীতি, চালচলন এবং সমস্যা ও তার সমাধানের কর্ম - আর মালিক ও শ্রমিককে ভিত্তি করে যে সমাজ সে সমাজের কৃষ্টি, রীতিনীতি, চাল-চলন এবং সমস্যা ও তার সমাধানের কর্ম একই রকম হতে পারে না। কৃষি উৎপাদন ভিত্তিক সমাজে অগ্রহায়ণে নতুন ফসলের নবান্নের উৎসবের যে আমেজ, শিল্প উৎপাদন ভিত্তিক সমাজে তা আর সেভাবে হয়তো থাকে না তাকে ফর্ম (রূপ) এবং কনটেন্ট (বিষয়বস্তু) দুইই পাল্টাতে হয়। ফলে বিশ্ব কর্মার কর্ম ও তার রূপ এবং বিষয়বস্তু পাল্টাবেই। তাই খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতি থেকে লালন শাহ পর্যন্ত মহামানবেরা তাদের ব্যক্তিক কর্মযজ্ঞে যে ধর্ম প্রসার করেছিলেন এবং বর্তমানের সাধককূল যা করছেন তা আজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপে এবং তার পরিপূরক বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের অগ্রসর করতে হবে। যতই দিন যাবে ততই শ্রম বিভাগ বাড়বে, বাড়বে কর্মের ব্যক্তিক রূপকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপে সম্পাদন করার অনিবার্যতা। সেই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই হোক আমাদের দেশ গড়ে তোলার প্রেরণা।

পৃথিবীতে ব্যক্তি সামষ্টিক সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে অগ্রসরতার জন্য। পশ্চাদপদতা বা ধর্মাত্মতা বা ধর্মীয় উগ্রতা রক্ষার জন্য কর্মের যে ব্যক্তির স্বার্থরূপ - সমষ্টির স্বার্থরূপে পর্যবসিত হচ্ছে তাই মানবতার নামাবলী জড়িয়ে বিভিন্ন ধারণা ও আকারে আমাদের মধ্যে ঢোকানো হচ্ছে। মানবতা নিয়েও শুধু আমাদের সমাজে নয়, আমাদের গ্রহেই নানা ধরনের তমাসাচ্ছন্ন ধারণা বিদ্যমান।

স্কুল চোখে অনেকেই মানবতা মানে ত্রাণ তৎপরতা কিংবা চিকিৎসা তৎপরতা বুঝে থাকে। আমি মানবতাকে নার্সিং হোম মনে করি না। আমি মানবতাকে কোনো ত্রাণ কমিটিও মনে করি না। আমাদের রুঢ় সত্যের কাছে পৌঁছতে হবে। ল্যাটিন আমেরিকার এক ডাক্তার ভদ্রলোক বলেছিলেন সমাজ দারিদ্র্যতা আর অনাহার তৈরি করবে। সেখান থেকে মানুষ অপুষ্টিতে ভুগে রোগগ্রস্ত হতেই থাকবে আর আমি বিনামূল্যে তাদের চিকিৎসা করতেই থাকবো - এর শেষ কোথায়? এভাবে চলবে না। চিকিৎসা যদি করতেই হয় তবে আগে সমাজের চিকিৎসা করতে হবে। যাতে মানুষ অপুষ্টিতে না ভোগে।

প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অনুকূল করার প্রচেষ্টায় না নিয়ে প্রতিকূলতাকেই উৎসাহিত করলাম আর বিপর্যয়ের পরে ত্রাণ কমিটি করে ত্রাণকর্তা হয়ে গেলাম। এতে নিজের মধ্যে ত্রাতা হওয়ার পুলক থাকতে পারে, ভোট রাজনীতি করা যেতে পারে, কিন্তু সমাজে মানবতা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। আমাকে মাফ করবেন, এসব বলে আমি ত্রাণ এবং চিকিৎসার বিপক্ষে দাঁড়াতে চাইছি না - নিশ্চয় ত্রাণ এবং চিকিৎসা ইত্যাদি আমরা করবো কিন্তু মানবতার মূল কাজ তা নয় এ কথা মনে রেখেই গৌণ কাজ হিসেবে তা করবো।

তা হলে মানবতার মূখ্য কাজ কি? আমি মনে করি সমাজকে সংস্কার করাই মানবতার মূখ্য কাজ। মানুষের প্রতি মানুষের দায়বোধ, দরদ সৃষ্টি করাই মানবতার মূখ্য কাজ, মানুষকে মানুষ হিসেবে ভালোবাসাই মানবতার মূখ্য কাজ। সেই ভালোবাসা আত্মস্থ করার আঙুনে পুড়ে হিরন্ময়ের সমাজ তৈরি করাই মানবতার মূল কাজ। মানুষ যাতে ভাব এবং কর্মের যজ্ঞে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভেদাভেদহীন ভাবে নিয়োজিত করার পরিবেশ পায় তা নিশ্চিত করাই হোক মানবতার আজকের দিনের মূখ্য কাজ। □